স্থূল দর্শনে সূক্ষ্ম জগৎ

অভিজিৎ লাহিড়ী

এক

সূক্ষ্মতন্ত্রীয় গতিতত্ত্ব বা কোয়ান্টাম তত্ত্বই এখন পর্যন্ত বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কে সব চাইতে মৌলিক, সব চাইতে অনুপুঙ্খ, নিবিড় ও 'সফল' তাত্ত্বিক প্রকল্প । 'সাফল্যের চাইতে সফল আর কিছুই নয়' -- এ কথাই কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রমাণ করে এসেছে এক নাগাড়ে বহু দশক ধরে, বহু সমালোচনা বিতর্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে । বিজ্ঞানের বহু রথী-মহারথী যখন কোয়ান্টাম তত্ত্বকে একটা মৌলিক তত্ত্বের স্বীকৃতি দিতেই আপত্তি জানিয়েছেন এর বহুবিধ রহস্যময়তার কারণে, তখনই একের পর এক নানান চমকপ্রদ ও সফল সব ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত উপস্থিত করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে পদার্থবিদ্যার এই দুর্বিনীত ও উদ্ধত একক সৈনিকটি । কোন এক যাদু-মস্তিস্কের সহায়তায় বিচিত্র কৌতুকের খেলায় মেতে পর্যুদস্ত করেছে সমালোচক আর দার্শনিকদের । সনাতনী পদার্থবিদ্যার সমগ্র বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গীকে তছনছ করতে চেয়েছে তার অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটিয়ে ।

অবশ্য কোয়ান্টাম তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধিতা এসেছে শুধু বাইরে থেকে নয়, কেবল সনাতনী পদার্থবিদ্যার মঞ্চে দাঁড়ানো বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের থেকেই নয়, অনেকটা ভিতর থেকেও । তবে এভাবেই বা বলছি কেন ? 'বাইরে থেকে' , 'ভিতর থেকে' -- এ কথাগুলি অনেকটা অর্থহীন শোনায় যখন স্বয়ং আইনস্টাইন, স্বয়ং শ্রোয়েডিঙ্গার তীক্ষ্ণ সংশয় প্রকাশ করেন এই নব্য বিজ্ঞানের কাঠামো বিষয়ে, যে কাঠামোর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তাঁরা নিজেরাই । বিপ্লবের রথের চাকায় পিষ্ট হন বিপ্লবের প্রথম প্রজন্মের নির্মাতারা । আর তারপর বিপ্লবের ইতিহাস ঘাঁটলে গুলিয়ে যায় কে বিপ্লবী কে প্রতিবিপ্লবী তার গোটা সংজ্ঞাটাই ।

দুই

জন্ম-লগ্ন থেকে পরিণতি পর্যন্ত কোয়ান্টাম তত্ত্বের ইতিহাসকে পর পর ছুটে আসা কয়েকটা তরঙ্গের অভিঘাত বলে ভাবা যায় । প্রথম তরঙ্গ প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন ও তাঁদের সতীর্থরা । এরপর বোর, বর্ন, শ্রোয়েডিঙ্গার, হাইজেনবার্গ, পাউলি ও লান্ডাও । আর তার সঙ্গে সেই সৃষ্টির নেশায় মাতাল-করা সময়ের আরো বহু বিজ্ঞানী । এর ভিতর বোরের অবস্থান স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার মতো । সে কথায় পরে আসছি । পরবর্তী তরঙ্গ বলা চলে ডিরাক ও ভন নয়ম্যান। আর তারপর ফেইনম্যান । ভন নয়ম্যান কোয়ান্টাম তত্ত্বকে একটা সুস্পষ্ট গাণিতিক কাঠামো দিলেন এবং এক প্রখর গাণিতিক আলোয় উদ্ভাসিত করলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমগ্র ক্ষেত্রটিকে । আর ফেইনম্যান দিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের নতুন এক উপস্থাপনা যা আভাস দিল ক্লাসিকাল বা সনাতনী পদার্থবিদ্যার সঙ্গে এর সম্পর্কের একটা দিকের । অবশ্য ফেইনম্যানের আরো পরিচিত অবদান হল অন্য কয়েকজন পথিকৃতের পাশাপাশি কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের স্থাপত্য গড়ে তোলা । এই ফেইনম্যানই আবার এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিযোগে ইঙ্গিত দিলেন কোয়ান্টাম তথ্য-বিজ্ঞান নামক সম্ভাবনাময় শাখাটির । আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিশাল পর্বতের গায়ে পাকদন্ডী পথের এই সাম্প্রতিক পাকে এসে পুনরুজ্জীবিত হল কোয়ান্টাম মতবাদের প্রথম যুগের নানান মৌলিক প্রশ্ন । অনুষ্ঠিত হল একের পর এক নানান ইন্দ্রজাল-তুল্য পরীক্ষণ । কোয়ান্টাম তত্ত্ব আর একবার প্রমাণ দিল তার গগনচুম্বী সাফল্যের । আর এই দ্বিতীয় অশ্বমেধ শুরু হল যাঁর হাত ধরে তিনি হলেন জন এস . বেল । যদিও আইনস্টাইনের মতই বেলও আবার বরাবর কিছুটা সংশয়ী ছিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গী ও কাঠামোটি নিয়ে ।

তিন

কোয়ান্টাম বিপ্লবের সূচনা-মুহূর্তটি থেকেই এক গভীর ও প্রায় অনপনেয় দ্বি-মনস্কতায় জর্জরিত হয়ে এসেছে পদার্থবিজ্ঞানের বিশ্ব-দর্শন । কোপারনিকাস-গ্যালিলিও-নিউটনের হাত ধরে 'আধুনিক' বিজ্ঞানের জন্ম-লগ্নেও ছিল দর্শনের একইরকম অভ্যন্তরীন টানাপোড়েন । একটু সরলীকরণের ঝুঁকি নিয় একে বলা যায় 'ভাববাদ' আর 'বস্তুবাদ'-এর সংঘাত । তবে সে সংঘাত ছিল শুধু পদার্থবিজ্ঞানের বা শুধু বিজ্ঞানের আঙিনায় নয়, এক অর্থে মানুষের বৃহত্তর জীবনদর্শনে, বলা চলে তার জীবনচর্চায় । আর সব চাইতে বড় কথা, নিউটনীয় বিজ্ঞান যত পরিণতি পেয়েছে ততই নিরসন হয়ছে এই বিরোধের । কারণ নিউটনীয় বিজ্ঞান নিজেই ক্রমশ হয়ে উঠেছে এক ধরণের বস্তুবাদী দর্শনের ধারক বা বাহক । 'এক ধরণের বস্তুবাদ' বলছি এই কারণে যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব কিন্তু এই ক্লাসিকাল বস্তুবাদকেই ঠেলে দিয়েছে কঠোর পরীক্ষার মুখে -- সে কথায় আসছি । কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্তর্বস্তুকে এক সামগ্রিক বিশ্ব দর্শনের অঙ্গীভূত করতে গিয়ে পদার্থবিজ্ঞান যে বিরোধের ঘূর্ণীপাকে পড়েছে তা কিন্তু আরো প্রবল ও অমোঘ । আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্রমিক সাফল্যের সঙ্গে এই বিরোধ ক্রমশ নিরসনের দিকে গিয়েছে, এমনও নয় । ক্লাসিকাল বস্তুবাদের নিরিখে কোয়ান্টাম তত্ত্বের তত্ত্বগত ও পরীক্ষণলব্ধ অন্তর্বস্তু এতই বেখাপ্পা যে ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যা বা ক্লাসিকাল বস্তুবাদ কোনদিনই প্রসন্ন মনে স্বীকৃতি দেয় নি কোয়ান্টাম তত্ত্বকে, এমনকি আজও কোয়ান্টাম তত্ত্বকে মেলাতে পারে না তার বিশ্ব-দর্শনের সঙ্গে । পুরানো রাজাকে হঠিয়ে নতুন সম্রাট বসেছে সিংহাসনে, অথচ সীলমোহরে রয়ে গেছে পুরানো রাজার মুখের ছাপ -- এই হল পদার্থবিজ্ঞানের দর্শন । কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্তর্বস্তুতে ঢুকে যদি মূল সমস্যার জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করতে হয় তবে ঢুকে পড়তে হবে গণিত ও তাত্ত্বিক আলোচনার বিসর্পিল পথে । একটি সমস্যা হল কণা-তরঙ্গ দ্বি-চারিত্র্য বা ওয়েভ-পার্টিক্‌ল ডুয়ালিটি । একটি ইলেকট্রন বা ফোটন (আলোক-কণা --এর অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছিল প্লাঙ্ক ও আইনসটাইনের পথ-নির্দেশী গবেষণায়) একইযোগে তরঙ্গ

আবার কণা । এ কথা মেনে নেওয়া সত্যিই বড় দুরূহ । বলা চলে, এক ধরনের যৌক্তিক বিপর্যয় । অথচ ইয়ং-বর্ণিত দ্বি-ছিদ্র পরীক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণ করলে এই বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণের কোন পথ কোন ভাবেই খুঁজে পাওয়া যায় না ।

উপযুক্ত কোন এক উৎস থেকে একবর্ণী আলো একটি পর্দায় ফেলা হল যাতে রয়েছে পরস্পরের কাছাকাছি দুটি সূচী-ছিদ্র । এই পর্দার বিপরীত পাশে রাখা হল দ্বিতীয় আর একটি পর্দা যার ওপর এসে পড়বে সূচী-ছিদ্র থেকে নির্গত আলো । এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পর্দাটিতে দেখা যায় এক বিশেষ ধরণের নক্সা যার ভিতর কোথাও কোথাও আলোর প্রাবল্য বেশী, আবার কোথাও কম -- একে বলা হয় ব্যতিচার-নক্সা । এই নক্সা তৈরী হওয়ায় সুষ্ঠু ব্যাখ্যা পাওয়া যায় আলোর তরঙ্গ-তত্ত্বের সহায়তায় । ফ্রেনেল ও হাইজেনস থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ম্যাক্সোয়েলে এসে চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছিল এই তত্ত্ব । বস্তুত, কোয়ান্টাম তত্ত্বের মতই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ-তত্ত্বও পদার্থবিজ্ঞানের এক সুদূরপ্রসারী বিপ্লব । কিন্তু তরঙ্গ-তত্ত্বের সহায়তায় ব্যতিচার-নক্সা তৈরীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, শুধু এ কথা বলে থেমে গেলে চলবে না । কারণ আলোর ফোটন সত্ত্বা বা কণা ধর্মও ত একই রকম অনস্বীকার্য । এর সাহায্যেই ত প্লাঙ্ক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কৃষ্ণবস্তু বিকিরণের শারীরতত্ত্বের । বস্তুত ইয়ং পরীক্ষণের দ্বিতীয় পদার্থটির বদলে যদি পাশাপশি অনেকগুলি স্বতন্ত্র ফোটন-নির্দেশক যন্ত্র বসিয়ে রাখা হয় তবে আলোক-নক্সাটির বদলে দেখা যাবে, যন্ত্রগুলি একটি একটি করে ফোটন সনাক্ত করছে । এরকম বহু সংখ্যক ফোটন সনাক্ত হওয়ার পর কোথায় কতগুলি ফোটন পৌঁছল, হিসেব করলে দেখা যাবে ঠিক ঐ ব্যতিচার-নক্সার মতই একটি নক্সা -- কোথাও ফোটন এসে পড়েছে বেশী সংখ্যায় আর কোথাও বা কম, আর পাশাপাশি ঐ কম-বেশীর অঞ্চলগুলি নিয়ে তৈরী হয়েছে নক্সা । আসলে, কোন একটি ফোটন ঐ দুই সূচী-ছিদ্রের ভিতর কোনটি দিয়ে যে নির্গত হবে তা জানার কোন উপায়ই নেই ইয়ং-বর্ণিত উপরোক্ত পরীক্ষণে ।

কিন্তু ফোটনটি ঐ দুই সূচী-ছিদ্রের কোন না কোন একটি দিয়ে যে নির্গত হচ্ছে সেটা ত ঠিক -- অটল প্রত্যয়ে বলছে ক্লাসিকাল পদার্থ-বিজ্ঞান । পরীক্ষণটি সামান্য বদলে নিয়ে, দ্বিতীয় পর্দায় বা পাশাপাশি সাজানো ফোটন নির্দেশক যন্ত্রগুলিতে পর পর এসে পড়া ফোটনগুলি প্রথম পর্দার কোন ছিদ্র দিয়ে বেরোচ্ছে, সেটা যদি সনাক্ত করা যায় তা হলেই ত আর কোন গোল থাকে না । তখন ব্যতিচার-নক্সা তৈরীর পেছনে স্বতন্ত্রভাবে ফোটন কণাগুলির গতিপথের ভূমিকা জানা যাবে । আলোর তরঙ্গ-সত্তার কথা না ভেবে শুধু কণা সত্তা ধরেই ব্যতিচার-নক্সা তৈরীর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে তখন ।

পরীক্ষণটিকে এভাবে বদলে নিয়ে যা দেখা যায় তা কিন্তু পর্যুদস্ত ও বিমূঢ় করে ক্লাসিকাল চিন্তাধারাকে । ফোটনের গতিপথ সনাক্ত করতে গেলেই বিলুপ্ত হয় ব্যতিচার-নক্সা এবং আবির্ভূত হয় ব্যতিচার-নক্সার তুলনায় সরলতর আর একটি আলোক-নক্সা । এই দ্বিতীয়োক্ত নক্সাটির ব্যাখ্যা আরো সহজ । দুটি সূচী-ছিদ্রের ভিতর একটি করে ছিদ্র পরপর বন্ধ করে দ্বিতীয় পর্দাটির বিভিন্ন স্থানে দু দফায় পাওয়া প্রাবল্যের যোগফলই হল এই সরলতর নক্সাটির ব্যাখ্যা । ব্যতিচার-নক্সার বেলায় কিন্তু ‘প্রাবল্যের যোগফল’ এই সহজ সূত্রটি খাটে না । তার বদলে খাটে ‘বিস্তারের যোগফল’ এই গভীরতর সূত্রটি । যার সঙ্গে ওতপ্রোত ফোটনের তরঙ্গ-সত্তার ধারণাটিও ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ফোটনের (ইলেকট্রন বা অন্য কোন কণার বেলায়ও একই কথা) কণিকা সত্তাটিকে অনুসন্ধানের অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিটি ফোটনের গতিপথ সনাক্ত করতে গেলেই মিলিয়ে যায় ব্যতিচার-নক্সা । অর্থাৎ ব্যতিচার-নক্সার মূল নিহিত আছে ফোটনের তরঙ্গ-সত্তায় । অথচ দ্বিতীয় পর্দাটিতে অথবা পাশাপাশি সাজানো ফোটন নির্দেশক যন্ত্রগুলিতে ফোটনগুলি কিন্তু এসে পড়ছে এক রকটি কণা রূপেই । অর্থাৎ ইয়ং পরীক্ষণে যদি ব্যতিচার-নক্সা তৈরী হয় তবে সে ক্ষেত্রে ফোটন কণাগুলি স্বতন্ত্রভাবে কোন ছিদ্র দিয়ে বেরোচ্ছে তা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় এক ব্যাপার ।

এই হল সুগভীর ও তীব্র এক দহ । এই দহের মারাত্মক টান এড়িয়ে কোনভাবেই পরিত্রাণ পায়নি ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের চিন্তাধারা । ব্যতিচার-নক্সা গঠিত হলে স্বতন্ত্র কণা রূপে ফোটনগুলির গতিপথের ধারণাটিই আর অর্থবহ থাকে না । অথচ যে কোন কণার গতিপথের ধারণাটি ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার এক মৌলিক ধারণা । বহু বার বহুভাবে পরীক্ষণ ব্যবস্থাটির অদল-বদল ঘটিয়েও কিছুতেই নিরসন ঘটানো যায় নি কোয়ান্টাম পর্যবেক্ষণ আর ক্লাসিকাল ধারণার বিরোধের ।

ক্লাসিকাল ধারণা বলছে, যে কোন ফোটন কণার 'গতিপথ' তার এক মৌলিক গুণ বা ধর্ম । ব্যতিচার-নক্সা গঠিত হল কি না হল তার উপর নির্ভরশীল হতে পারে না এই গুণ বা ধর্মের অস্তিত্ব । কোন পরীক্ষণ-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করছে যে সব কণা বা কণা-তন্ত্র তাদের প্রতিটিরই নিশ্চয় এরকম পূর্ব-নির্দিষ্ট কিছু গুণ বা ধর্ম রয়েছে -- বস্তুত এই সব গুণ দিয়েই সংজ্ঞায়িত হয় সেগুলির অস্তিত্ব । ব্যবস্থাটির ফলশ্রুতি রূপে পাওয়া পর্যবেক্ষণ কি দাঁড়াবে তা নির্ধারিত হবে এইসব গুণ দ্বারা, কিন্তু কোন বিপরীত ক্ষমতা বলে কখনই সে পর্যবেক্ষণের জমিতে দাঁড়িয়ে এগুলির ভিতর এক বা একাধিক গুণের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা চলবে না । ব্যবহারিক বিচারে এর যে কোনটিই কমবেশী দুর্জ্ঞেয় হতে পারে, অজ্ঞেয় কখনই নয় ।

ক্লাসিকাল বস্তুবাদী দর্শন বিষয় ও বিষয়ীর ভিতর বিষয়কে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয় । বিষয় নিজেকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য বিষয়ীর দিকে উন্মুখ প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকে না, কারণ সে জানে যে তার গুণময় অস্তিত্বের ওপর বিষয়ীর কোন হাতই নেই । বিষয়ীই বরং সকুণ্ঠ অনুসন্ধিৎসায় নেড়ে-চেড়ে দেখে বিষয়ের বর্ণাঢ্য ও প্রায় অনন্ত বৈচিত্র্যময় হীরকখন্ডটিকে । এক এক বার সে প্রত্যক্ষ করে হীরকখন্ডের এক একটি বিচিত্র আকৃতির সীমাতল । আর এই তল দিয়ে বিচ্ছুরিত এক একটি বর্ণের দ্যুতি । কখনো হয়ত মোহের বশে সে দাবী

করে বসে যে হীরকের অনন্ত-জটিল আকৃতি বা তার দ্যুতিময়তা তারই, অর্থাৎ বিষয়ীরই অর্পিত গুণ । কিন্তু নিমেষের বিদ্রূপে সে দাবী নাকচ করে বস্তুবাদ । বিশপ বার্কলী যখন বলেন, 'অস্তিত্ববান হওয়া মানে অনুভূত হওয়া', আইনস্টাইন তখন আপাত-নিরীহ শ্লেষ সহযোগে প্রশ্ন করেন, আকাশের চাঁদের দিকে যখন কেউ তাকিয়ে নেই তখন কি বিলীন হয়ে যায় সে চাঁদ ?

কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও তার পরিক্ষণ-লব্ধ সিদ্ধান্ত এক বোধহীন নির্বিকার প্রতিপক্ষের মত অমোঘ আঘাত হেনেছে এখানেই । সে দেখাচ্ছে, সূক্ষ্ম কণার জগতে কোন বস্তুর গুণাবলী আসলে কনটেক্সচুয়াল বা প্রসঙ্গ-নির্ভর । পরীক্ষণ-ব্যবস্থা নিরপেক্ষ ভাবে তন্ত্রের অমুক গুণ বা তমুক গুণের প্রাক্-নির্দিষ্ট অস্তিত্ব ঘোষণা সম্ভব নয় ।

ক্লাসিকাল ও কোয়ান্টাম উভয় তত্ত্বেই পরীক্ষাধীন তন্ত্রের তাৎক্ষণিক দশা বা স্টেট-এর ধারণাটি মৌলিক । তবে ভৌত ও গাণিতিক বিচারে দুই ক্ষেত্রে ধারাটি দু'রকম - দুইয়ের ভিতর ব্যবধান দুস্তর । অবশ্য এই দুইয়ের বিভাজন রেখার দুপাশে রয়েছে এমন এক প্রত্যন্ত-প্রদেশ যেখানে আবার কোয়ান্টাম ও ক্লাসিকাল ধারণা পরস্পরের হাত ধরে এক ধরণের আত্মীয়তা ঘোষণা করে, যেমন করে রাজনৈতিক সীমানার এপার আর ওপারের মানুষেরা ।

তন্ত্রের এক একটি দশায় তার এক এক প্রস্থ গুণের নির্দিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । অপর গুণগুলি তখন প্রকাশমান নয় । এ ক্ষেত্রে ক্লাসিকাল তত্ত্ব বলবে, প্রকাশমান না হতে পারে তবে তা বলে সেগুলির অস্তিত্ব নাকচ হয়ে যায় নি -- সেগুলি রয়েছে ঠিকই, রয়ে গেছে চোখের আড়ালে । উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা কাজে লাগালেই সেগুলি সম্মুখে এসে দাঁড়াবে অসংকোচে । কোয়ান্টাম তত্ত্বের মুখে কিন্তু তখন ফুটে ওঠে গা-জ্বালানো হাসি । সে জানে, দশার ধারণাটির ভিতর নিহিত আছে প্রায় অনন্ত গাণিতিক ও ভৌত রহস্য । যেমন --

দুটি ভিন্ন কোয়ান্টাম দশার সমাপতনে সৃষ্ট হয় তৃতীয় এক ভিন্নতর দশা । প্রথম দুটি দশায় পরীক্ষণাধীন তন্ত্রের নির্দিষ্ট কোন গুণ যদি দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু নির্দিষ্ট ভৌত রাশি সহযোগে প্রকাশযোগ্য হয়, তবে সমাপতিত তৃতীয় দশাটিতে কোন ভাবেই ঐ গুণটির মান নির্দেশক কোন সুনির্দিষ্ট ভৌত রাশির সন্ধান পাওয়া যাবে না । যেমন -- দ্বি-ছিদ্র পরীক্ষণে পর পর দু দফায় একটি করে সূচীছিদ্র বন্ধ রাখলে ফোটনের যে দুটি দশা উৎপন্ন হয় তার প্রতিটিতেই ফোটনের একটি নির্দিষ্ট গতিপথ সংজ্ঞায়িত হয় । কিন্তু দুটি সূচী-ছিদ্র একযোগে খুলে রাখলে উদ্ভূত হয় ফোটনের সমাপতিত এক তৃতীয় দশা -- এ দশায় ফোটনের গতিপথ নামক গুণটি হয়ে ওঠে অজ্ঞেয় । পরীক্ষণাধীণ কোন কোয়ান্টাম তন্ত্রের যে কোন দশাতেই সাধারণত সেটির একটি বা কয়েকটি গুণকেই শুধু নির্দিষ্ট ভৌত মান সহযোগে নির্দেশ করা যায়, অপর গুণগুলি তখন খুইয়ে বসে তাদের বস্তুগত অস্তিত্ব কারণ তাদের কোন সুনির্দিষ্ট ভৌত মান তখন থাকে না । তাদের অস্তিত্বের স্বীকৃতি সীমিত হয়ে পড়ে বিভিন্ন মানের সম্ভাব্যতা নির্দেশে ।

চার

কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাব্যতার এই অনপনেয় ভূমিকা কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞান সম্ভাব্যতার । এই ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞান সম্ভাব্যতার ব্যাপারটা বোঝে না এমন নয় । ভালই বোঝে । ম্যাক্সওয়েল, বোলৎসম্যান, গিব্‌স -- এঁদের হাতে তৈরী রাশিতাত্ত্বিক গতিতত্ত্বের পুরোটাই প্রতিষ্ঠিত সম্ভাব্যতার ধারণার উপর (অবশ্য গিবস্‌ই প্রথম ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এই তত্ত্বের কাঠামোটিও নিশ্ছিদ্র নয়, অতি সূক্ষ্ম এক ছিদ্র দিয়ে শনির মত এই ক্লাসিকাল কাঠামোয়ও ঢুকে পড়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভৌতিক আত্মা) । তবে সেখানে সম্ভাব্যতা স্বীকৃতি পায় কোন তন্ত্র বা তন্ত্রের ভিতরকার কণাগুলি সম্পর্কে আমাদের আংশিক অজ্ঞতার ফলশ্রুতি রূপে । যেমন সিলিণ্ডারে ধরা গ্যাসের সামগ্রিক দশা বর্ণনায় গ্যাসের বহু সংখ্যক অণুর প্রতিটির গতীয় দশার অনুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন

নেই কারণ এ জ্ঞান অর্জন বস্তুত সম্ভব নয় । আর এই ব্যবহারিক অজ্ঞতাই আমাদের বাধ্য করে অণুগুলির গতীয় গুণাবলীকে সুনির্দিষ্ট মানের বদলে সম্ভাব্যতা সহযোগে নির্দেশ করতে । তবে এটা কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের আর পাঁচটা ব্যাপারের মতই একটা সুবিধাজনক আপোষ ছাড়া আর কিছু নয় । পর্যবেক্ষকের যদি প্রাণ চায় তবে সে কোন একটি বা কয়েকটি অণুকে বেছে নিয়ে সেগুলির আণুবীক্ষণিক বর্ণনা দিতেই পারে । যেমন, সমাজজীবনে ব্যক্তি মানুষ সন্ত্রস্ত থাকে এই ভেবে যে (রাষ্ট্ররূপী) 'বড়দা নজর রাখছে' -- বড়দার প্রয়োজন হয় না বলে ব্যক্তির সম্পর্কে সে উদাসীন কারণ গোটা সমাজের গুরু দায়িত্ব তার কাঁধে । কিন্তু ব্যক্তির নাড়ি-নক্ষত্র থাকে তার হাতের মুঠোয় । অবশ্য এর পরের প্রশ্ন, সত্যিই কি থাকে ? ব্যক্তির অনন্ত রহস্যময়তা শেষ পর্যন্ত কিন্তু বড়দার আঙুল গলে ব্যাপ্ত হয় সমগ্র চরাচরে ।

ঠিক এরকমই, সম্ভাব্যতার ব্যাপারে কোয়ান্টাম তত্ত্ব কোন আপোষ বা কোন ক্লাসিকাল বড়দার অনুমোদন বোঝে না । সম্ভাব্যতার মূল সেখানে নিহিত কোন আংশিক অজ্ঞতায় নয়, এক মৌলিক অজ্ঞেয়তায় । আর এখানেই দারুন আপত্তি ও বিতৃষ্ণা জানায় ক্লাসিকাল দর্শন । সে তখন ভেবে-চিন্তে হাজির করে এক প্রকল্প - আচ্ছা, কোয়ান্টাম তত্ত্ব যাকে অজ্ঞেয়তা বলছে, আসলে তা পর্যবেক্ষকের আংশিক অজ্ঞতা, এভাবে ভাবলে দোষ কি ? এমন ত হতেই পারে যে পর্যবেক্ষকের চোখের আড়ালে কোন সুদূর গভীরতায় রয়ে যায় একপ্রস্থ সংগুপ্ত তথ্য এবং এই অজানা তথ্যগুলিই পর্যবেক্ষককে বাধ্য করে কোয়ান্টাম তন্ত্রের দশা বর্ণনায় সম্ভাব্যতার আশ্রয় নিতে । ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের এই আপোষ প্রস্তাবে কিন্তু সাড়া দেয় না কোয়ান্টাম তত্ত্ব । সে আবার তার সেই অসহ্য ঔদ্ধত্য সহকারে নাকচ করে এই 'গুপ্ত চলকের তত্ত্ব' (hidden variable theory; যে কোন তন্ত্রের গুণাবলী এক প্রস্থ ভৌত চলরাশি বা ভেরিয়েব্‌ল সহযোগে নির্দেশিত হয়; এই চলকগুলির মানই নির্দিষ্ট করে দেয় তন্ত্রটির দশা -- অন্তত ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞান এ ভাবেই ভেবে থাকে) ।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের দুঃসহ রহস্যময়তার বিপরীতে নানাভাবে নানান আদলে গুপ্ত চলকের তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই । বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ এক জটিল বিচিত্র অধ্যায় । এক বিদগ্ধ গাণিতিক শৈলীর সহায়তায় ভন নয়ম্যান প্রথম প্রমাণ করলেন, গুপ্ত-চলকের তত্ত্ব কোয়ান্টাম পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কারন এই তত্ত্বের ভিতরেই রয়েছে গলদ ও স্ব-বিরোধ । গাণিতিক হিসেবে ভন নয়ম্যানের বিশাল মর্যাদা তখনকার মত মুখ বন্ধ করল ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের মঞ্চে দাঁড়ান সমালোচকদের।

বস্তুত সমালোচকদের দিকে প্রায় ধমকের সুরে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছুঁড়ে দেয় একটাই কথা ঃ ‘বকবক করবেন না, অঙ্ক কষুন’ (‘shut up and calculate!’) । সাময়িক ভাবে চুপসে যায় অঙ্ক না বোঝা সমালোচকেরা । কিন্তু তাদেরকে পাকাপাকি ভাবে চুপ করিয়ে দেওয়াও বড় দুঃসাধ্য । কিছুটা অঙ্ক তারা নিজেরা শিখে নেয় আর তাদের দলে এসে যোগ দেয় আবার অঙ্ক জানা কিছু ‘বুদ্ধিমান’ লোকও । এদের ভিতরই আবার দেখা পাওয়া যায় কিছু কোয়ান্টাম তাত্ত্বিকেরও, কোয়ান্টাম বিজ্ঞান যাদের মননকে পীড়িত করেছে বড় বেশী মাত্রায়। বিপ্লবোত্তর নির্মম হৃদয়হীন নৈরাজ্য সইতে না পেরে বিপ্লবের নির্মাতা যেমন বলে ওঠে ‘এ বিপ্লব চাই না’ ।

আর একদল তাত্ত্বিক অবশ্য গণিতের পথ ধরে গড়ে তুলতে থাকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের রাজকীয় প্রাসাদটিকে । অঙ্ক না কষে বকবক করাটা তাদের পছন্দ নয় । এদেরই সম্মিলিত মেধায় তৈরী হয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের যাদু-মস্তিস্ক । যার জোরে অপ্রতিরোধ্য স্পর্ধায় দিগ্বিজয়ে বেরোয় পদার্থবিজ্ঞানের নতুন সম্রাট ।

পাঁচ

তৃতীয় আর এক দল কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক শুধু অঙ্ক কষার ভিতর বা শুধু পরীক্ষাগত সাফল্য লাভের চরিতার্থতা খুঁজে পান না, এঁরা চান শুধু একটা গাণিতিক তত্ত্ব নয়, একটা

বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে অর্থবহ তত্ত্ব, যে তত্ত্বের হাত ধরে বিশ্ব-প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ কোন এক মৌলিক উপলব্ধির আলো দেখবে । যা হবে এক সামগ্রিক বিশ্ব-দর্শনের অন্যতম মূল উপাদান । এঁরা এক দিকে যেমন কোয়ান্টাম তত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তার তাত্ত্বিক ও গাণিতিক প্রকৌশল অনুসরণ করে বা সেই প্রকৌশলকে পূর্ণতর ও উন্নততর রূপ দিয়ে, অপর দিকে আবার বিচলিত বোধ করেছেন এর নানান কুহেলিকাময় অথচ অনস্বীকার্য সিদ্ধান্তে । এঁদের ভিতরই ছিলেন বোর, ছিলেন জন . এস . বেল । বোরেরই বিখ্যাত উক্তি -- 'কোয়ান্টাম তত্ত্বে যাঁরা বিভ্রান্ত বোধ করেন না, তাঁরা এই তত্ত্ব বোঝেনই নি' । বোরের পাশাপাশি আইনস্টাইনের অবস্থান ও মনোভাবে কিন্তু বিষাদের ছোঁয়া আছে । বোর যেখানে বিভ্রান্ত বোধ করেও এগিয়েছেন তরূণ প্রজন্মের হাত ধরে তাদের সঙ্গে হেঁটে, তাদেরকে একরকম নেতৃত্ব দিয়েই, কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল স্রোতে অংশগ্রহণ করেও এর বিভ্রান্তি পেরিয়ে একে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এক বৃহত্তর উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে, আইনস্টাইন কিন্তু সেখানে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্যতম স্রষ্টা হয়েও নিজেকে একটু একটু করে বিচ্ছিন্ন করেছেন এর মূল স্রোত থেকে, অংশগ্রহণ করেন নি কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিজয়-মিছিলে । অবশ্য ইতিহাস কখনো নায়কের উজ্জ্বল ছবিতে বুলিয়ে দেয় মালিন্যের প্রলেপ আর বিপরীত খেয়ালে ট্র্যাজেডির বিষাদ-ছোঁয়া সঙ্গীত থেকেই সৃষ্টি করে হৃদয় উদ্বেল করা নতুন সুরের প্রেরণা । তাই বোর আর আইনস্টাইনের উত্তরাধিকারেও দেখা যায় এই বৈপরীত্যের চালচিত্র ।

কোয়ান্টাম পরীক্ষণগুলির সাহায্যে অণু-পরমাণু-ইলেকট্রন-ফোটনের সূক্ষ্মজগতের যে ছবিটা ফুটে ওঠে, আমাদের চারপাশের পরিচিত স্থূল জগতের ঘটনাবলীর নিরিখে তা প্রায় এক দুর্বোধ্য পরাবাস্তবতার চিত্র । নিউটনীয় বিজ্ঞান হয় স্থূল জগতের বাস্তবতার তত্ত্ব, কোয়ান্টাম বিজ্ঞান তা হলে সূক্ষ্মজগতের এই পরাবাস্তবতার নির্যাস । তত্ত্ব বাস্তবের অনুলিপি নয়, তা আসলে বাস্তবের এক নির্যাস । তত্ত্ব যদি বাস্তবের অনুপুঙ্খ অনুলিপি হত তবে তা হয়ে পড়ত মূল্যহীন । আসলে তা বাস্তবতার নির্যাস বলেই তার সহায়তায়

বস্তুজগতের ঘটনাবলীকে আমরা আমাদের কাজে লাগাতে পারি । আর এই নিরিখেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব এক অসাধারণ সাফল্যের কাহিনী । তবে এখানেই কিন্তু মিটে যায় না ব্যাপারটা । তত্ত্ব যদি হয় বাস্তবের নির্যাস , দর্শন তা হ'লে তত্ত্বের নির্যাস । বাস্তব ও তত্ত্বকে অতিক্রম করে এক ব্যপক ও গভীর অনুভবই হল দর্শন, যার আলোয় অর্থবহ হয়ে ওঠে তত্ত্ব, উপলব্ধির চরিতার্থতা পায় গণিতের সমীকরণ ।

আইনস্টাইনের মত বোরও চেয়েছিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বকে এক বৃহত্তর দর্শনের সঙ্গে মেলাতে । তবে মেলাতে গিয়ে আইনস্টাইন যেখানে আক্রান্ত হয়েছেন এক গভীর অতৃপ্তিবোধে এবং অল্প অল্প করে নিজেকে বিযুক্ত করেছেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল স্রোত থেকে, বোর সেখানে প্রাণপণ প্রয়াসে দাঁড় করাতে চেয়েছেন কোয়ান্টাম পরাবাস্তবতার এক দর্শন । তবে বাস্তব কারণেই বোরের এ প্রয়াসের পরিধি ছিল কিছুটা সীমাবদ্ধ, আর তাই সম্ভবত বোরের উজ্জ্বল ছবিতে পড়ে কিছুটা মালিন্যের প্রলেপ । বস্তুত বিজ্ঞানী হিসেবে কোয়ান্টাম তত্ত্বের তত্ত্বগত নির্মাণে বোরের যত না অবদান তার চাইতে বেশী প্রয়াস প্রয়োগ করতে হয়েছে বোরকে এক বৃহত্তর দর্শনের পটভূমিতে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে তাঁর সময়কার বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে । তাঁর বিজ্ঞানী জীবনের অনেকটা সময় জুড়েই তাই বোর নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটা দর্শনগ্রাহ্য ভাষ্য তৈরী করতে, পদার্থ বিজ্ঞানের এক প্রশস্ততর দর্শনের নিরিখে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে । এভাবেই গড়ে উঠেছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিখ্যাত 'কোপেনহেগেন ভাষ্য' যা পর পর একাধিক প্রজন্মের বিজ্ঞানীদেরকে সাহস জুগিয়েছিল কোয়ান্টাম পরাবাস্তবতা থেকে মুখ না ফিরিয়ে নিয়ে, একে অস্বীকার না করে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যেতে, সাফল্যের শিখর থেকে উচ্চতর শিখরে উন্নীত করতে ।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোপেনহেগেন ভাষ্য হয়ে দাঁড়াল কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের একটা সরকারী হলফনামার মতন -- এর প্রতি অনুগত্য দেখালেই কোয়ান্টাম শিবিরের 'ভেতরের লোক'

আর না দেখালে ‘বাইরের লোক’ । ভেতরের লোকেরা কোয়ান্টাম তত্ত্ব বোঝে, আর বাইরের লোকেরা বোঝে না । তাদেরকে তাই মাঝে মাঝে মৃদু ধমকের সুরে বলতে হয় ‘বকবক করবেন না, অঙ্ক কষুন’ । সমাজবিপ্লবের বেলায় যেমন বিজ্ঞানের ইতিহাসেও তেমনই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র পরিণত হয় এক সরকারী অনুশাসনের হলফনামায় ।

অবশ্য যতটা বলছি ততটা মারাত্মক অধঃপতন ঘটেনি কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের অনুগামীদের । তবে একটা অলক্ষ্য পরিবর্তন ঘটেছিল ঠিকই, যদিও তাতে বোরের ব্যক্তিগত ভুমিকা বা অভিপ্রায় কোনটাই ছিল না । আর এভাবে একটা ইতিবাচক ও পথ-নির্দেশক প্রয়াস রূপে যাত্রা শুরু করে শেষ পর্যন্ত প্রায় একটা সূত্রায়নে পরিণতি পেল কোপেনহেগেন ভাষ্য ঠিক এই কারণেই যে বিজ্ঞানের বিপ্লবের পাশাপাশি দর্শনেরও বিপ্লব ঘটিয়ে সেই নতুন দর্শনের আলোয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের মর্ম ব্যাখ্যার কোন চেষ্টা করেন নি বোর । এ চেষ্টা করা তাঁর সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর পক্ষে সম্ভব বা এমনকি অভিপ্রেত ছিল কিনা তা ভিন্ন প্রশ্ন । এর ফলে কতটা মন্দীভূত হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অগ্রগতি বা আদৌ মন্দীভূত হয়েছে কিনা সে প্রশ্নও ভিন্ন । বস্তুত কোয়ান্টাম তত্ত্বের দফায় দফায় দুর্বার অগ্রগতির বড় কারণই হল, তাঁদের কাজের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা দর্শনের প্রশ্ন তুলে ভারাক্রান্ত করেননি তাঁদের স্পর্ধিত অনুসন্ধিৎসাকে । আর কোপেনহেগেন ভাষ্য দর্শনের ক্ষেত্রে যতই অযোগ্য হোক, কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিজ্ঞানগত অন্তর্বস্তুকে একটা স্পষ্ট ও কার্যকর রূপ দিয়েছিল প্রথমত বোর আর তার সঙ্গে হাইজেনবার্গের প্রচেষ্টায় । বোরের তুলনায় হাইজেনবার্গের দর্শনগত ভাবনা ছিল আরো অনেক অস্বচ্ছ ও স্ব-বিরোধী, কিন্তু তিনি কোপেনহেগেন ভাষ্যকে দিয়েছিলেন সেই ভারসাম্য যার জোরে এটা শুধু দর্শনের কূটপ্রশ্নে সীমাবদ্ধ না থেকে তার তুলনায় আরো অনেক বেশী করে নজর দিয়েছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বকে একটা স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে । এই প্রয়াসে সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন শ্রোয়েডিঙ্গার, বর্ন, পাউলি, ডিরাক, সবাই । দ্রুত ধাবমান হয়েছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিজয়রথ । কিন্তু তবু কোপেনহেগেন

ভাষ্যের রূপকার হিসেবে প্রধানত স্বীকৃত হয়েছেন বোরই । কারণ তিনিই সবচেয়ে বেশী করে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এক বৃহত্তর দর্শনের পটভূমিতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অর্থ খোঁজার কাজে । আর তাই কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিজ্ঞানগত অন্তর্বস্তুতে বোরের গবেষণালব্ধ অবদান তাঁর সময়কার তরুণ বিজ্ঞানীদের তুলনায় তেমন বেশী না হলেও কোয়ান্টাম তত্ত্বের রূপকার বলে যদি একজনের নাম করতে হয় তবে তিনি হবেন বোরই।

অবশ্য বোরের এই ভুমিকা পালনের পিছনে নেতিবাচক অর্থে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি কিন্তু আইনস্টাইনই । পদার্থবিজ্ঞানের প্রাণ-পুরুষ আইনস্টাইন যেখানে কোয়ান্টাম তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন, করছেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আন্তর্বস্তু নিয়ে ততটা নয় যতটা তার সামগ্রিক তাত্ত্বিক কাঠামোটা নিয়ে, সেখানে সেই সংশয়ের পিছুটান কাটিয়ে একটা গোটা প্রজন্মের তরুণ বিজ্ঞানীদেরকে কোয়ান্টাম তত্ত্বে অনুসন্ধিৎসু করে রেখেছিল বোরের কোপেনহেগেন ভাষ্য, আইনস্টাইনের মর্যাদার বিপরীতে আর একটি মর্যাদার শিবির তৈরী করে । তবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব গড়ে ওঠার পেছনে আইনস্টাইনের ঈষৎ নেতিবাচক কিন্তু বিশাল তাৎপর্যপূর্ণ অবদান সীমিত থাকে নি শুধু কোপেনহেগেন ভাষ্যের নির্মাণ প্রেরণায় । কোয়ান্টাম তত্ত্বের এক সম্পূর্ণ নতুন যুগের সূচনা ঘটিয়েছিল তা । ঘটিয়েছিল যাঁর মাধ্যমে তিনিই হলেন জন . এস . বেল । আর তাই কোয়ান্টাম তত্ত্বের ইতিহাসে আইনস্টাইনের ভুমিকায় ঈষৎ বিষাদের ছোঁয়া থাকলেও তা থেকেই আবার সৃষ্টি হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের নবযুগের এক উজ্জ্বল ঐকতান । এরই সাম্প্রতিক ফলশ্রুতি হল কোয়ান্টাম তথ্য-বিজ্ঞান ।

ছয়

গুপ্ত-চলকের তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য নয়, কোয়ান্টাম তত্ত্বের কাঠামোয় এর কোন স্থান নেই, এই মর্মে ভন নয়ম্যান যে গাণিতিক প্রমাণ দিয়েছিলেন, নয়ম্যানের গাণিতিক প্রতিভার

পৃষ্ঠপোষকতায় যা চুপ করিয়ে দিয়েছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমালোচক ও বিরোধী শিবিরকে, তারই ভিতরকার একটি গলদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বেল । অবশ্য ভন নয়ম্যান নিজেই তাঁর প্রমাণের দুর্বলতার দিকটি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, আর তাঁর পরও অনেকে নানাভাবে চেষ্টা করেও নয়ম্যানের প্রমাণটিকে নিশ্ছিদ্র করতে পারেন নি । এই জায়গা থেকেই এক ধাপ এগিয়ে বেল দেখালেন, একটা নির্দিষ্ট সীমিত পরিসরের ভিতর গুপ্ত-চলকের তত্ত্বের সঙ্গে কোন বিরোধই নেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের । অর্থাৎ ঐ সীমিত পরিসরের ভিতর বস্তুত কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে ক্লাসিকাল দৃষ্টিভঙ্গীর অমিল তেমন মারাত্মক নয় । বরং ঐ পরিসরের ভিতর বলা যেতে পারে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের নানান গুণ বা ধর্মের ভৌত মান প্রসঙ্গে কোয়ান্টাম তাত্ত্বিকেরা যে অজ্ঞেয়তার কতা বলেন তা কোন মৌলিক ব্যাপার নয়, হয়ত বা কোন এক প্রস্থ গুপ্ত-চলকের মান সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার প্রকাশ মাত্র । কোয়ান্টাম তত্ত্ব বিষয়ে প্রথম দিকে এই তত্ত্বে সম্ভাব্যতার ভূমিকা নিয়ে আইনস্টাইনের যে আপত্তি ছিল (‘ঈশ্বর এই জগৎটা নিয়ে পাশা খেলছেন, এমনটা হতেই পারে না’) তা কিছুটা সমর্থন পেল বেলের কাজে । তবে আইনস্টাইন কিন্তু পরের দিকে তাঁর আপত্তি বা সমালোচনার প্রধান বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পরাবাস্তবতার অনেকটা ভিন্ন আর এক উপাদানকে । আর এটিকে অনুসরণ করে বেল সম্পূর্ণ নতুন এক মাত্রা দিলেন গুপ্ত-চলকের তত্ত্ব সংক্রান্ত বিতর্ককে । অত্যন্ত অনাড়ম্বর নেপথ্যচারিতায় প্রায় যেন স্বগতোক্তির মত করে সূচনা করলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের এক নতুন যুগের ।

দুই সহকর্মী পোডলস্কি ও রোজেনের সঙ্গে লেখা আইনস্টাইনের এক বিখ্যাত নিবন্ধ (ই . পি . আর . নিবন্ধ নামে পরিচিত) কোয়ান্টাম পরাবাস্তবতার যে দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাকে অনেক সময় ‘ভৌতিক দূরক্রিয়া’ বলে উল্লেখ করা হয় । পদার্থ বিজ্ঞানীরা দূরক্রিয়া বা অ্যাকশন বা অ্যাট এ ডিসট্যান্স ব্যাপারটা কোনদিনই মেনে নিতে পারেন নি । দেশ-মন্ডলের কোন এক অঞ্চলে অবস্থিত কোন তন্ত্র অপর এক অঞ্চলে অবস্থিত দ্বিতীয় একটি তন্ত্রের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না, যদি না প্রথমটি

থেকে দ্বিতীয়টিতে কোন সংকেত সঞ্চালিত হয়ে তা সম্ভবপর করে তোলে । এই সংকেত সঞ্চালিত হতে পারে দেশ-মন্ডলে কোন না কোন তরঙ্গ রূপে, যার দৃষ্টান্ত হল তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ । শূন্য মাধ্যমে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গই সম্ভাব্য সব ধরনের সংকেতের ভিতর সবচাইতে দ্রুতগামী । এই সর্বোচ্চ বেগটিকে অনেক সময় সংক্ষেপে 'আলোর বেগ' বলে উল্লেখ করা হয় । তা হলে দুটি তন্ত্রের ভিতর দূরত্বের উপর নির্ভরশীল একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম সীমার কম সময়ে কখনই একটির উপর অপরটির কোন প্রভাব সঞ্চারিত হওয়া সম্ভব নয় ।

ই . পি . আর . নিবন্ধের রচয়িতারা দুটি ভিন্ন কণা সহযোগে গঠিত একটি যৌগিক তন্ত্রের কথা কল্পনা করলেন । তাঁরা ধরে নিলেন, কণা দুটি কোন এক সময় খুব কাছাকাছি ছিল এবং তখন তাদের ভিতর স্থাপিত হয়েছিল এমন এক আন্তঃসম্পর্ক যার ছাপ ঐ যৌগিক তন্ত্রটি বহন করবে বহু দূরবর্তী সময় পর্যন্ত । ধরা যাক এই বিশাল সময়ের ব্যবধানে কণা দুটি পরস্পরের থেকে বহু দূরে সরে গেছে ও এবারে সে দুটির ভিতর কোন একটি কণাকে বেছে নিয়ে উপযুক্ত কোন এক পরিমাপ প্রক্রিয়ায় সেটির কোন এক নির্দিষ্ট গুণ বা ধর্মের রাশিগত মান নির্ণয় করা হল । এই নির্ণীত মানটি দেখে ও কণা দুটির ভিতরকার প্রারম্ভিক আন্তঃসম্পর্কের কথা মাথায় রেখে দ্বিতীয় কণাটির অনুরূপ গুণ বা ধর্মের রাশিগত মানও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নিরূপণ করা যেতে পারে । কণা দুটি পরস্পরের থেকে বহু দূরে অবস্থিত বলে প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টিতে কোন সংকেত সঞ্চালিত হয়ে নিশ্চয় তাকে প্রভাবিত করতে পারেনি । অর্থাৎ দ্বিতীয় কণাটির বেলায় যে রাশিগত মানটি আমরা পেয়েছি সেটি তার তাৎক্ষণিক দশায় তার নিজস্ব একটি বস্তুগত গুণ বা ধর্মের ভৌত মান । ঐ মানটি এক্ষেত্রে অন্য-নিরপেক্ষভাবে ঐ দ্বিতীয় কণাটির ঐ তাৎক্ষণিক দশার এক বস্তুগত বৈশিষ্ট্য । কোন চালাকির খেলা খেলে কোনভাবেই এর অস্তিত্বের বাস্তবতা অস্বীকার করা যেতে পারে না । আবার প্রথম কণাটির উপযুক্ত অপর একটি ধর্মের মান নিরূপণ করে দ্বিতীয় কণাটির ক্ষেত্রে অনুরূপ দ্বিতীয় একটি ধর্মের ভৌত

মানও নিরূপণ করা যেতে পারে একই ভাবে । কোয়ান্টাম তত্ত্বকে এবারও ঢোক গিলে এই দ্বিতীয় ভৌত মানটির বাস্তবতা স্বীকার করে নিতেই হবে । কিন্তু দ্বিতীয় কণাটির ঐ দুটি ধর্মের রাশিগত মান কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী যুগপৎ নির্ণয়যোগ্য নাও হতে পারে (কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই বিখ্যাত নীতিটিকেই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে গাণিতিক রূপ দেন হাইজেনবার্গ) অর্থাৎ ই . পি . আরের যুক্তি অনুযায়ী দূরক্রিয়ার সম্ভাবনা স্বীকার না করলে (অন্যভাবে বলা চলে, শুধুমাত্র স্থানিক ক্রিয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করলে) কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটা অসঙ্গতি প্রকাশ হয়ে পড়ছে । ই . পি . আর অবশ্য এটিকে অসঙ্গতি না বলে 'অসম্পূর্ণতা' বলে অবিহিত করলেন, কারণ তাঁদের মতে কোয়ান্টাম তত্ত্বে নিহিত মৌলিক অজ্ঞেয়তার নীতিটি (এরই এক ফলশ্রুতি হল যূগপৎ অনির্ণেয়তার নীতি) আসলে তত্ত্বের এক অসম্পূর্ণতা ছাড়া আর কিছু নয় । এখানেই আবার এসে পড়ছে কোয়ান্টাম তন্ত্রের তাৎক্ষণিক দশার নির্ধারক রূপে যবনিকার আড়ালে অবস্থিত গুপ্ত-চলকের সম্ভাব্যতার কথা ।

বেল যখন প্রথম গুপ্ত-চলকের বৈধতা দেখিয়েছিলেন তখন কিন্তু তিনি তাঁর বিশ্লেষণ সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন একটি নির্দিষ্ট সীমিত পরিসরের ভিতর । এরপর যখন তিনি ই . পি . আর নিবন্ধের সূত্র ধরে যৌগিক তন্ত্রের বেলায় গুপ্ত-চলকের তত্ত্বটির প্রযোজ্যতা বিশ্লেষণ করেন তখন তিনি দেখেন, এই প্রশস্ততর পরিসরে কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে গুপ্ত-চলককে মেলান যথেষ্ট দুরূহ । কারণ এক্ষেত্রে দুটি কণার জন্য দুই প্রস্থ স্বতন্ত্র গুপ্ত-চলক ধরলে চলবে না, এমন এক প্রস্থ গুপ্ত-চলকের অস্তিত্ব ধরে নিতে হবে যা একযোগে দুটি কণার তাৎক্ষণিক দশা নির্ধারণ করবে । এই ধরণের গুপ্ত-চলকের অস্তিত্ব স্বীকার করলে ই . পি . আরের পক্ষে রায় দেওয়া যায় বটে, তবে এমন এক ধরণের দূরক্রিয়ার স্বীকৃতি দিয়ে 'আইনস্টাইন যা নিজেই অপছন্দ করতেন' (বেল) । গুপ্ত-চলকগুলি যদি স্থানিক চরিত্রের হয়, অর্থাৎ প্রতিটি কণার বেলায় যদি দশা-নির্ধারক স্বতন্ত্র এক প্রস্থ গুপ্ত-চলক থাকে তবে সেগুলি দিয়ে কোয়ান্টাম জগতের আচরণবিধি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাবে না ।

এখন গুপ্ত-চলকগুলি স্থানিক না অস্থানিক তা কে বলে দেবে ? অন্তত বেল রাজি হলেন না এই দায় নিজের কাঁধে তুলে নিতে । তার বদলে তিনি পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করা যায় এমন এক প্রস্থ সর্তের কথা বললেন যা স্থানিক গুপ্ত-চলকের তত্ত্বটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শুধু তাই নয়, কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তের সঙ্গে আবার ঐ শর্তগুলি সঙ্গতিপূর্ণ নয় । এইভাবে একটি স্পষ্ট বিভাজন রেখা টেনে দিয়ে সরে দাঁড়ালেন বেল, কারণ এরপর একমাত্র পরীক্ষণই বলে দেবে প্রাকৃতিক বাস্তবতা আসলে কোথায় দাঁড়িয়ে ।

পরীক্ষণের ফল কিন্তু রায় দিল কোয়ান্টাম তত্ত্বের দিকেই, অর্থাৎ স্থানিকতার নীতি মেনে গুপ্ত-চলকের তত্ত্ব সজিয়ে কোনভাবেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের পর্যবেক্ষণগুলিকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় । বেল ও আন্যান্য কোয়ান্টাম তাত্ত্বিকেরা একে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অ-স্থানিকতা নাম দিয়েছেন যা এর সঙ্গে ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানের এক মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করে । অবশ্য অস্থানিকতা বলতে কোন দূর-ক্রিয়া বোঝান হচ্ছে না কারণ আলোর বেগের চাইতে বেশী বেগে সঞ্চালিত কোন সংকেতের অস্তিত্ব বা সম্ভাবনা নির্দেশ করে না এটি ।

সাত

বস্তুত ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞান বা ক্লাসিকাল ধ্যান-ধারনার সাপেক্ষে এটি এক অনপনেয় ও অমীমাংসেয় স্বাতন্ত্রের দিক । কোন যোগিক তন্ত্রের তাৎক্ষণিক দশা বর্ণনায় এই স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম । স্থানিকতা বা অ-স্থানিকতার নিরিখে না ভেবে অন্য আর একভাবেও নির্দেশ করা যায় এই স্বাতন্ত্র্যের দিকটিকে । ক্লাসিকাল পদার্থবিজ্ঞানে দুই বা ততোধিক কণার তাৎক্ষণিক দশার ভিতর যে আন্তঃসম্পর্ক থাকা সম্ভব (আন্তঃসম্পর্ক ব্যাপারটিকে একটি গাণিতিক রূপ দেওয়া যায় এবং সে ক্ষেত্রে একটি রাশিগত মানের সাহায্যেও একে নির্দেশ করা যায়) কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলে যে তার অতিরিক্ত কিছু পরিমাণ আন্তঃসম্পর্ক

থাকতেই পারে কণাগুলির ভিতর । এটি সম্পূর্ণভাবেই কোয়ান্টাম জগতের অন্তর্ভুক্ত যে কোন যৌগিক তন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং একে 'এনট্যাঙ্গলমেন্ট' বা 'নিবদ্ধতা' নামে আভিহিত করা হয় । অর্থাৎ দুই বা ততোধিক তন্ত্রের ভিতর আন্তঃসম্পর্কের দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাংশ রয়েছে - একটি হল ক্লাসিকাল উপাংশ আর অপরটি কোয়ান্টাম উপাংশ বা নিবদ্ধতা । এই নিবদ্ধতার কোন ক্লাসিকাল ব্যাখ্যা নেই, থাকা সম্ভব নয় কারণ এটি একান্তভাবেই যৌগিক তন্ত্রের কোয়ান্টাম দশার বর্ণনার সঙ্গে সম্পর্কিত । আমাদের চারপাশের বিশ্বপ্রকৃতিকে যদি স্থূলবিশ্ব ও সূক্ষ্মবিশ্ব এই দুই ভাগে ভাগ করি (অবশ্য আগেই বলেছি এদের ভিতরকার বিভাজন রেখাটি অলঙঘ্য নয়) এবং কোন একটি মাত্র স্বাতন্ত্র্য চিহ্ন দিয়ে সনাক্ত করতে চাই সূক্ষ্মবিশ্বকে তবে তা হবে নিবদ্ধতা । অবশ্য সূক্ষ্মবিশ্বের আচরণবিধি বর্ণনার ব্যবহারিক বিচারে নিবদ্ধতাকে এভাবে স্বতন্ত্র গুরুত্বের আসনে বসালেও গাণিতিক বিচারে কিন্তু নিবদ্ধতা সে অর্থে কোন মৌলিক ব্যাপার নয় - কোয়ান্টাম তন্ত্রের দশা বর্ণনার পদ্ধতিপ্রকরণেই নিহিত রয়েছে এর মূল । যৌগিক তন্ত্রের ক্ষেত্রে এই দশা বর্ণন প্রকরণেরই একটি ফলশ্রুতি হল নিবদ্ধতা । বেলের নামাঙ্কিত বিখ্যাত বেল অ-সমীকরণের সূত্রায়ণ ও তার পরীক্ষণগত যাচাইয়ের মধ্যে দিয়েই সূচনা হয়েছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বে নিবদ্ধতার গুরুত্ব উপলব্ধির ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের পর্যায়টির । এই পর্যায়টিই হল কোয়ান্টাম বিপ্লবের দ্বিতীয় স্বর্ণযুগ ।

আট

প্ল্যাঙ্ক ও আইনস্টাইনের পথনির্দেশী আবিষ্কারের পর প্রধানত বোর ও হাইজেনবার্গের হাতেই সূচনা হয়েছিল কোয়ান্টাম বিপ্লবের প্রথম স্বর্ণযুগের । উনিশ শতকের দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম দশক পর্যন্ত সময়কাল জুড়ে এই যুগ । এরপর পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে আসে আর এক অধ্যায় , তত্ত্ব ও পরীক্ষণ যেখানে ক্লাসিকাল ধ্যান-ধারণাকে ছাড়িয়ে চলে গেল আরো বহুদূর । এরপর ষষ্ঠ থেকে অষ্টম দশক জুড়ে এক দিকে যেমন বিজ্ঞানীদেরকে ভাবিয়েছে

কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের কিছু গভীর সমস্যা ও প্রশ্ন, অন্য দিকে তেমনই আবার উচ্চতর শক্তি সম্পন্ন মৌল কণাদের আচরণবিধি ব্যাখ্যায় অর্জিত হয়েছে চোখ ধাঁধাঁনো কিছু সাফল্য ও শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে 'স্ট্যান্ডার্ড মডেল' । বস্তুত, স্ট্যান্ডার্ড মডেলই একটা শক্ত জমির ওপর দাঁড় করাল কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বকে । তবে এর পরও নাগালের বাইরে রয়ে গেল বহু প্রশ্ন ও সমস্যা - একটা ঐক্যবদ্ধ তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিতর মেলান গেল না কোয়ার্ক কণাগুলির আচরণবিধিকে আর মহাকর্ষীয় আন্তঃক্রিয়াকে । পদার্থবিজ্ঞানীরা তাঁদের সমবেত উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবারে নিয়োজিত করলেন তন্তু-তত্ত্ব বা 'স্ট্রিং থিয়োরী'র দিকে -- শুরু হল 'সব কিছুর তত্ত্ব' নামক পরশ-পাথরের খোঁজ । এরই পাশাপাশি পদার্থবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ নিযুক্ত হলেন জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বের গবেষণায়, আর অপর এক দলের লক্ষ্য দাঁড়াল ঘনীভূত পদার্থের আচরণবিধি ব্যাখ্যা ও সে সংক্রান্ত তত্ত্বের নানান প্রয়োগ । এই সব এবং এরকম আরো কিছু প্রয়াসের মাঝে প্রায় নেপথ্যে প্রকাশিত হল বেলের গবেষণা । পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই হল বেলের অ-সমীকরণ । ফলত, পাদপ্রদীপের আলো থেকে কিছুটা দূরে সূচনা হল কোয়ান্টাম বিপ্লবের দ্বিতীয় যুগটির ।

বোর ও হাইজেনবার্গের হাতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রথম যুগটির সূচনা হওয়ার পর যাঁদের গবেষণায় বাস্তবায়িত হয়েছিল প্রথম স্বর্ণযুগটির, তাঁরা সকলেই প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন পদার্থবিজ্ঞানে ও গণিতে । এঁদের ভিতর বেশীর ভাগই ছিলেন একদল তরুণ মেধাবী বিজ্ঞানী , সঙ্গে ছিলেন অপেক্ষাকৃত প্রবীণ কয়েকজনও । তবে বেলের হাতে দ্বিতীয় যুগটির সূচনা হওয়ার দশ বছরেরও বেশী সময় পর উনিশ শ আশির দশক থেকে কোয়ান্টাম বিপ্লবের দ্বিতীয় স্বর্ণযুগটিকে বাস্তবায়িত করলেন যাঁরা তাঁদের অনেকেরই প্রশিক্ষণ ও প্রারম্ভিক গবেষণা কিন্তু যন্ত্রগণক বিজ্ঞান বা কম্প্যুটার সায়েন্সে, বিশেষত এর গাণিতিক দিকটিতে । ততদিনে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রথম যুগটি শেষ হয়ে কায়েম হয়েছে এক ধরনের রক্ষণশীলতার মনোভাব , প্রথম যুগের তরুণ বিজ্ঞানীদের বেহিসেবী উদ্দামতা ও ঔদ্ধত্যের

জায়গায় দেখা দিয়েছে প্রায় আত্মতৃপ্তি ও আনুগত্যের এক মানসিকতা, আর সে আনুগত্য সমর্পিত হয়েছে কোপেনহেগেন ভাষ্য নামক কর্তৃত্বের পদপ্রান্তে ।

অবশ্যই এক কথা বলছি না যে ধর্মীয় গুরুবাদের মত করে কোপেনহেগেন ভাষ্য কণ্ঠরোধ করেছে নতুন চিন্তাধারা বা ধ্যানধারণার । তবে এ ধরনের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অবস্থানে পৌঁছেছে তা । বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছে কোয়ান্টাম শিবিরের 'ভেতরের লোক' ও 'বাইরের লোক' - এর মাঝে । কোপেনহেগেন ভাষ্যই হয়ে উঠেছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের স্বীকৃত প্যারাডাইম । আর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের মতই কোপেনহেগেন ভাষ্যের অনুশাসনের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করে দলছুট হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আরো কিছু ভাষ্য ।

কোপেনহেগেন ভাষ্য এক দিকে যেমন কোন সূক্ষজাগতিক বা কোয়ান্টাম তন্ত্রের গুণাবলীর ভৌত মানের অজ্ঞেয়তার কোন সন্তোষজনক দার্শনিক ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত যোগাতে পারে নি, অপর দিকে তেমন ভন নয়ম্যানের গাণিতিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ হয়েও নিবদ্ধতার ধারণাটিকে স্পষ্ট করতে পারে নি ও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে নি । আর, প্রথম থেকেই এটি জর্জরিত হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের বহু-আলোচিত 'তরঙ্গফলন বিপর্যয়' ও 'পরিমাপ সমস্যা'র ব্যাখ্যা ও মীমাংসার ব্যর্থ চেষ্টায় । এবং এই কারণেই একটা দীর্ঘ যুগ ধরে কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিজ্ঞানগত অন্তর্বস্তুকে চিহ্নিত ও আলোকিত করার ইতিবাচক ভূমিকা সত্ত্বেও তা ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছে কিছুটা রক্ষণশীল এক মতবাদে ।

নয়

আগেই বলেছি, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের তুলনায় কোয়ান্টাম তত্ত্বে কোন কণা বা কণাতন্ত্রের তাৎক্ষণিক দশার ধারণাটি ভিন্ন । যে রাশিরূপটির সাহায্যে এই দশা গাণিতিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তার নাম তরঙ্গফলন বা 'ওয়েভফাংশন' । এই গাণিতিক রাশিরূপটির

ভৌত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন বর্ন । কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাব্যতার ধারণাটির মৌলিক গুরুত্ব তুলে ধরেছিল বর্নের এই ব্যাখ্যা । পরবর্তী পর্যায়ে ডিরাক ও ভন নয়ম্যানের হাতে কোয়ান্টাম তন্ত্রের দশার ধারণাটি আরো গাণিতিক স্পষ্টতা পায় । কিন্তু তবু পরিমাপ সমস্যা ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত তরঙ্গফলন বিপর্যয়ের সমস্যার মীমাংসা পাওয়া যায় নি কোয়ান্টাম তত্ত্বে বা কোপেনহেগেন ভাষ্যে ।

কোন কোয়ান্টাম তন্ত্রের কোন গুণ বা ধর্মের পরিমাপ করে যখন তার ভৌত মান নিরূপণ করা হয় তখন তাকেই বলা হয় পরিমাপ প্রক্রিয়া । এর জন্য উপযুক্ত কোন এক পরিমাপ যন্ত্র কাজে লাগাতে হয়, যার সাহায্য নিয়ে পরীক্ষণাধীন তন্ত্রটির গুণবাচক মানটি নির্ণয় করতে হয় । এমন নয় যে, পরিমাপ প্রক্রিয়াটির আগে পর্যন্ত তন্ত্রটির তাৎক্ষণিক দশায় ঐ মানটি কোনভাবে সংকেতবদ্ধ ছিল, পরিমাপ প্রক্রিয়া সেটিকে প্রকাশ্যে এনে দিল মাত্র । মহাবীর হনুমানের হৃদয়কন্দরে যেমন অধিষ্ঠিত ছিলেন স্বয়ং রামচন্দ্র, বুক চিরে বিশ্ববাসীকে শুধু দেখানর অপেক্ষা । আসলে নির্দিষ্ট কোন মানই নিহিত ছিল না ঐ দশাটিতে, নিহিত ছিল কেবল বিকল্প কিছু মানের সম্ভাব্যতা । এটিই হল কোয়ান্টাম তত্ত্বে সেই অজ্ঞেয়তা যা প্রকট হয়ে ওঠে সমাপতিত দশার বেলায় এবং যাকে শেষ পর্যন্ত কোনভাবেই মেলান যায় নি ক্লাসিকাল ধ্যান-ধারণার সঙ্গে । ক্লাসিকাল পরিমাপের বেলায়ও একাধিক বিকল্প সম্ভাব্য মান থাকতে পারে, পরিমাপ প্রক্রিয়াটি তার ভিতর কোন একটি মানকে সনাক্ত করে -- তবে যে মানটি সনাক্ত হল সেটি কিন্তু আগে থেকেই পরীক্ষণাধীন তন্ত্রের দশায় বর্তমান ছিল, পরিমাপ প্রক্রিয়া জগৎবাসীকে শুধু জানিয়ে দিল সেটি । বস্তুবাদী বিশ্বদর্শনও এ কথাই বলে । ‘বিষয়’ তার সকল গুণ সহ এক স্বতঃ-অস্তিত্ববান সত্তা । বিষয়ীর কাজ হল নানান ফন্দি-ফিকির করে সেই প্রাক্-নির্ধারিত গুণগুলিকে জানা, ভৌত রাশির সাহায্যে তা প্রকাশ করা । করতে গিয়ে নানান ভ্রান্তির শিকার হতে পারে বিষয়ী, নানান ভুল ধারণা বিপথে চালিত করতে পারে তাকে, নানান ত্রুটিও ঢুকে পড়তে পারে পরিমাপলব্ধ মানে । এখানেই কঠোর সাধনার সংকল্প তার । সে সাধনার পথ ধরে প্রাক্‌নির্দিষ্ট মানটির

কাছাকাছি, আরো কাছাকাছি পৌঁছবে সে, এ বিশ্বাস ঐ আপনভোলা পাগলাটে সাধকটির সম্পর্কে ব্যক্ত করে রেখেছে ক্লাসিকাল বস্তুবাদী দর্শন । আর বিষয়ীর এই আত্মনিবেদিত সাধনায় তার সু-উচ্চ মহিমার আসন থেকে বিন্দু মাত্র বিচলিত হয় না বিষয় বা বস্তু । তার অন্তর্নিহিত গুণমানগুলি নীরবে অপেক্ষা করে ভক্ত বিষয়ীর গোচরে আসার ।

এখানেই কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়ে এক উদ্ভট সমস্যার সৃষ্টি করে কোয়ান্টাম তত্ত্ব । তার প্রথম গা-জ্বালানো দাবী, পরিমাপ যে ভৌত মানটিকে প্রকাশ করল তার নাকি কোন প্রাক্-নির্ধারিত অস্তিত্ব ছিল না পরীক্ষণাধীন তন্ত্রটির দশায় । আর এখানেই শেষ নয়, তার আরো দাবী, পরিমাপ প্রক্রিয়ার দরুনই এক অনপনেয় পরিবর্তন ঘটে যায় তন্ত্রের দশা-নির্দেশী তরঙ্গ-ফলনে । কোয়ান্টাম তত্ত্বে এটিই পরিচিত ‘তরঙ্গফলন বিপর্যয়’ নামে ।

কোপেনহেগেন ভাষ্য তরঙ্গফলন বিপর্যয়ের ঘটনাটিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে এই বলে যে পরিমাপ প্রক্রিয়ায় পরীক্ষণাধীন সূক্ষ্মজাগতিক তন্ত্রটি মুখোমুখি হচ্ছে স্থূলজাগতিক পরিমাপ যন্ত্রটির । স্থূলজগৎ ও সূক্ষ্মজগতের এই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকারে সূক্ষ্মজগৎ হারিয়ে বসে তার স্বতঃনির্ধারিত স্বাতন্ত্র্য । বিষয়ীর ভূমিকা এখানে কুণ্ঠিতচিত্ত ভক্ত সাধকের নয়, যার লক্ষ্য বস্তু-বিষয়কে তার নিজের জায়গা থেকে বিচ্যুত না করে তার গুণপনা উপলব্ধি করা, বিষয়ী বরং স্থূলদেহী দানব যার মুখোমুখি হয়ে ক্ষীণজীবী সূক্ষ্মদেহী বস্তু-বিষয় হয়ে পড়ে বিপর্যস্ত ।

সূক্ষ্মজগতিক কোয়ান্টাম তন্ত্র আর স্থূলজাগতিক পরিমাপ যন্ত্র, এই দুইয়ের স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েই রণে ভঙ্গ দিয়েছে কোপেনহেগেন ভাষ্য, আর তাই এক দুর্বোধ্য রহস্যময়তা পীড়িত করেছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনুগামীদেরও । শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর নামাঙ্কিত বিখ্যাত বিড়াল-কূট বা ক্যাট-প্যারাডক্সের মধ্যে দিয়ে অঙ্গুলী নির্দেশ করতে চেয়েছেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য কোন এক অসঙ্গতির দিকে ও আইনস্টাইনের মতই কোয়ান্টাম

তত্ত্বের অন্যতম স্রষ্টা হয়েও ক্রমশ দূরে সরে গেছেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল শিবির থেকে । আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের 'বিস্ময়-বালক' ফেইনম্যান বরাবর এই তত্ত্বের সামনের সারির বিজ্ঞানী হয়েও স্বীকার করেছেন, কোয়ান্টাম বিজ্ঞান বুঝতে ও বোঝাতে গিয়ে গভীর সমস্যা ও প্রশ্নে পীড়িত হয়েছেন তিনি । এই সমস্যা ও প্রশ্ন কোয়ান্টাম তত্ত্বের গাণিতিক বা বিজ্ঞানগত অন্তর্বস্তুর কোন ব্যাপার নিয়ে ততটা নয় । কারণ সে ক্ষেত্রে তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার কারণেই ফেইনম্যান ছিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের 'বিস্ময়-বালক' । এটা ছিল আসলে আমাদের স্থূলজাগতিক ধ্যান-ধারণা ও দর্শনের সঙ্গে কোয়ান্টাম পরাবাস্তবতাকে মেলানোর সমস্যা । তবে এই বৈপরীত্যের জায়গায় এসেই তফাৎ হয়ে গিয়েছিল শ্রোয়েডিঙ্গার ও ফেইনম্যানের মানসিকতা । শ্রোয়েডিঙ্গার স্থূলজাগতিক দর্শনের অনুশাসন এড়াতে না পেরে চেয়েছিলেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের গলদ খুঁজতে । তাঁর নিজের সৃষ্ট বিড়ালটিকে অনুসরণ করে প্রহেলিকাময় কোয়ান্টাম জগতে ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়ার মত বাউন্ডুলে ছিলেন না তিনি । আর জন্ম-বাউন্ডুলে ফেইনম্যান সেখানে অতিক্রম করতে চেয়েছেন তাঁর দর্শনগত পিছুটান, কোয়ান্টাম পরাবাস্তবতাকেই প্রকৃতির এক অলঙ্ঘ্য বাস্তবতা বলে মেনে নেওয়ার মত করে মনকে প্রস্তুত করতে চেয়েছেন তিনি । আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের তরুণ বিদ্রোহী প্রজন্মের মূল জোরের জায়গা ছিল এটাই -- জন্মসূত্রে পাওয়া দর্শন ও ধ্যান ধারণার তোয়াক্কা না করে কোয়ান্টাম তত্ত্বের জগতে ঝাঁপিয়ে পড়া । তবে এটা করতে গিয়ে কোন নতুন ও সমৃদ্ধতর বিশ্ব-দর্শন গড়ে তোলার তাগিদ বোধ করলেন না তাঁরা । বোর যে চেষ্টাটুকু করেছিলেন তা ছিল অনেকটা পুরান ছোট হয়ে যাওয়া জামাকেই টেনেটুনে বড় হয়ে যাওয়া শরীরে আঁটিয়ে নেওয়ার মত ব্যাপার । জামা কোনরকমে গায়ে গলান গেলেও ক্রমশ এঁটে বসতে থাকল তা । প্রতিনিয়তই একটা বিদগ্ধ দর্শনের অভাববোধে পীড়িত ও জর্জরিত হতে থাকল পদার্থবিজ্ঞান ।

দশ

কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রথম যুগের বিজ্ঞানীদের ভিতর ভন নয়ম্যানই শেষ পর্যন্ত পরিমাপ প্রক্রিয়ার একটা সুসঙ্গত তত্ত্ব তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন । কোপেনহেগেন ভাষ্য এক্ষেত্রে যে

পর্যন্ত এগিয়ে থেমে গিয়েছিল তার একটা যৌক্তিকতা খোঁজা দরকার মনে হয়েছিল তাঁর । কোয়ান্টাম তত্ত্ব অন্যান্য যে মৌলিক স্বীকৃতিগুলির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, যেগুলিকে ডিরাক ও তিনি নিজে সুসঙ্গত গাণিতিক কাঠামোয় বিধৃত করেছিলেন, শুধুমাত্র সেগুলির সাহায্যে তরঙ্গফলনের বিপর্যয়ের ব্যাখ্যা খুঁজতে চেয়েছিলেন তিনি । বস্তুত ভন নয়ম্যানের এই প্রচেষ্টার ফলে কোয়ান্টাম পরিমাপের সমস্যা ও তরঙ্গফলনের বিপর্যয় একটা স্পষ্ট গাণিতিক আলোচনার আওতায় এসে পড়ল । একে ঘিরে যে রহস্যের কুয়াশা জিইয়ে রেখেছিল কোপেনহেগেন ভাষ্য, তা ছিন্ন করতে চাইলেন তিনি ।

ভন নয়ম্যানের পর ফেইনম্যানকেই বলা যায় কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রথম যুগের শেষ বিজ্ঞানী যাঁর মানসিক প্রস্তুতি ছিল আর একটি নতুন যুগের সূচনায় অংশগ্রহণ করার মত । ভন নয়ম্যান আর ফেইনম্যান দুজনেই বস্তুত প্রায় তাঁদের নিজেদের অগোচরেই পরিমণ্ডল রচনা করে গেলেন এই দ্বিতীয় যুগটির আবির্ভাবের -- ভন নয়ম্যান তাঁর প্রস্তাবিত গাণিতিক পরিকাঠামোটি নির্মাণ করে; আর ফেইনম্যান, তথ্য বিজ্ঞানে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অপরিমেয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে ।

ভন নয়ম্যান তাঁর দশা-সংকারক বা ডেনসিটি অপারেটরের ধারণাটির সাহায্যে যৌগিক কোয়ান্টাম তন্ত্রের দশার গাণিতিক বর্ণনার উপযোগী একটি ব্যাপক পদ্ধতিপ্রকরণের সন্ধান দিয়েছিলেন । পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা তাকে কাজে লাগিয়ে যৌগিক তন্ত্রের অভ্যন্তরে কোয়ান্টাম আন্তঃসম্পর্ক বা নিবদ্ধতার ধারণাটি গড়ে তুললেন । আর এইভাবে তাঁরা প্রায় নিমেষে অতিক্রম করে গেলেন কোপেনহেগেন ভাষ্যের অধুনা-সংকীর্ণ দিগন্তটিকে । এ ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্তর্লীন অ-স্থানিকতার দিকটি পীড়িত করল না তাঁদের, কারণ বেলের অ-সমীকরণ ও তার পরীক্ষণগত যাচাই ততদিনে তাঁদেরকে জানিয়ে দিয়েছে, অ-স্থানিকতা কোয়ান্টাম তত্ত্বের এক অনস্বীকার্য অঙ্গ । অথচ এই অ-স্থানিকতার দিকটিই সবচাইতে বেশী বিচলিত করেছিল অইনস্টাইনকে । কোয়ান্টাম তত্ত্বের অঙ্গনে স্বেচ্ছামৃত্যুর

শরশয্যায় শয়ান হয়েছিলেন তিনি । বিজ্ঞানের ইতিহাস আর একবার প্রমাণ করল, সাবেকী দর্শন ও ধ্যানধারণার পিছুটান যখন ঝেড়ে ফেলে একটা গোটা প্রজন্ম তখনই আসে নতুন যুগ ।

কিন্তু যখন সে দর্শন প্রায় তিন - চার শতক ধরে 'বস্তুবাদ' বলে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে, যখন 'ভাববাদের' গভীর অন্ধকার থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে তা তখন এত আলগা উপেক্ষায় কি করে বর্জন করা যায় তাকে ? বিদগ্ধ মন শঙ্কিত হয় এই ভেবে যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ট্রয়ের ঘোড়ার জঠর থেকে হয়ত বা বেরিয়ে পড়বে ভাববাদের অন্তর্ঘাত বাহিনী । ঠিক যেমন বিপ্লবী মতাদর্শের ছত্রছায়ায় জীবনের পথ পেরিয়ে আসা মানুষ প্রাণ গেলেও স্বীকার করতে পারে না, কখন কিভাবে বিপ্লব রূপান্তরিত হয়ে গেছে দানবীয় রাষ্ট্রযন্ত্রে । ভয় পায়, বিপ্লবের এতদিনকার মতবাদের বিরোধিতা করতে গেলে প্রতি-বিপ্লবের থাবায় না সর্বস্ব খুইয়ে বসতে হয় তাকে । কারণ এতদিনকার এক অমোঘ সম্মোহনে এই মতবাদই তার কাছে এখন এক চিরকালীনতার তাৎপর্য পেয়ে বসে আছে ।

তবে এত সব পিছুটান ও শঙ্কার বাঁধন উপেক্ষা করে কোপেনহেগেন ভাষ্যের বন্ধ দরজাটিকে খুলতে চেয়েছিলেন যাঁরা তাঁদেরই ভিতর ছিলেন ভন নয়ম্যান, বেল ও ফেইনম্যান ।

ফেইনম্যান দেখিয়েছিলেন, ক্লাসিকাল নিয়মাবলীর ভিত্তিতে চালিত কোন যন্ত্রগণকের সাহায্যে কোন কোয়ান্টাম তন্ত্রের আচরণবিধির পূর্ণ বর্ণনা দেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য । বিপরীতে, যদি এ কাজে ব্যবহার করা হয় অপর কোন এক কোয়ান্টাম তন্ত্রকে, তবে তাই কিন্তু হয়ে দাঁড়ায় সহজসাধ্য । ফলত, তথ্য-বিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত দিয়েছেলেন তিনি । এই দিগন্ত অতিক্রমের চেষ্টা দিয়েই শুরু হল দ্বিতীয় কোয়ান্টাম বিপ্লব ।

এগারো

উনিশ শ আশির দশকে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের আঙিনায় জড়ো হয়েছিলেন কিছু উৎসাহী ও মেধাবী যন্ত্রগণক-বিজ্ঞানী যাঁরা তথ্য-বিজ্ঞানে তাঁদের প্রশিক্ষণকে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে । এঁদেরকে কিছুটা অনুপ্রাণিত করেছিলেন লান্ডাওয়ার, যিনি তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রটির নিরিখে যন্ত্রগণকের কার্যকারিতার একটা সীমা নির্দেশ করেছিলেন ও এইভাবে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানে ম্যাক্সওয়েলের যাদুকরের অপ্রতিহত প্রতাপ ও প্রতিপত্তি অবসানের । তাঁরই দেখান পথে এ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন চার্লস বেনেট । এখানেই কিন্তু থেমে গেলেন না এই তরুণ যন্ত্রগণক-বিজ্ঞানীর দল -- তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র ছেড়ে এবার তাঁরা ঢুকে পড়লেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের চত্বরে, যন্ত্রগণকের কার্যকারিতার সীমা কতটা সম্প্রসারিত হয় আনুবীক্ষণিক জগৎটিতে, তাত্ত্বিকভাবে তা যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে । আর এখানেই তাঁরা কাজে লাগালেন কোয়ান্টাম জগতের সেই পরাবাস্তবতাকে যাকে খোলা মনে স্বীকৃতিই দিতে পারেন নি আগেকার প্রজন্মের কোয়ান্টাম তাত্ত্বিকেরা । ফেইনম্যান বলেছিলেন, তিনিও পীড়িত বোধ করেন কোয়ান্টাম তত্ত্ব নিয়ে, তবে আগামী দিনের বিজ্ঞানীরা হয়তো পীড়িত বোধ করবেন না সেভাবে কারণ ততদিনে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে পীড়িত বোধ করার মত সত্যিই কিছু নেই । আজ যা ব্যাখ্যার অতীত এক পরবাস্তবতা বলে মনে হচ্ছে কাল তাই বাস্তবতার স্বীকৃতি পাবে কারণ ব্যাখ্যা দেওয়ার যে দার্শনিক পরিকাঠামো সেটিই হারিয়ে বসবে তার সর্বজনীন তাৎপর্য । অবশ্য তার জায়গায় গড়ে উঠবে কিনা আরো বিদগ্ধ, আরো সমৃদ্ধ ও আরো অন্তর্দৃষ্টি -সম্পৃক্ত কোন দর্শনের পরিকাঠামো, তা জানা নেই কারুরই । বেল বা ফেইনম্যান হয়ত এরকম কোন এক বিশ্বদর্শনের জমিতেই দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন শুধু কোয়ান্টাম তত্ত্বই নয়, তত্ত্বের সেই বিশুদ্ধতর নির্যাস যা মানুষের কাছে প্রকৃতিকে করে তোলে আর একটু অর্থবহ, আর এইভাবেই আর একটু তাৎপর্য ও মর্যাদা দেয় মানুষের নিজের অস্তিত্বকে ।

বারো

ফেইনম্যান অবশ্য দর্শনগত চিন্তাভাবনা, প্রশ্ন বা সংশয় নিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের গবেষণা ও অনুসন্ধানকে ভারাক্রান্ত করার বিরোধী ছিলেন বরাবরই । পূর্ব-স্বীকৃত ধারণার পিছুটান পছন্দ করেন নি তিনি । শুধু তিনি কেন, আগেই বলেছি, দর্শনগত ঐতিহ্যের প্রতি এই তাচ্ছিল্যের মনোভাবই বিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে ষাটের দশক পর্যন্ত কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীদের যুগিয়েছিল স্পর্ধা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস । কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রায় উদ্ভট সিদ্ধান্তগুলো যখন বেশী অস্বস্তিতে ফেলেছে কাউকে, কোন এক বিশ্ব-দর্শনের আলোয় যখন এগুলিকে দেখার প্রয়িজন বোধ করেছেন কেউ তখন তাঁরা নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে যে, আর কিছু না হোক কোপেনহেগেন ভাষ্য ত রয়েছেই । ফেইনম্যান কিন্তু নিজের মত করে কোয়ান্টাম তত্ত্বের 'অর্থ' খুঁজেছেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত । বস্তুত, তাঁর এই প্রয়াস থেকেই বলা চলে, উদ্ভাবিত হয়েছিল তাঁর বিখ্যাত 'পথ-সমাকল' - এর তত্ত্ব । যেখানে তিনি ক্লাসিকাল গতিতত্ত্বের আলোয় নির্দেশ করতে চেয়েছেন কোয়ান্টাম সম্ভাব্যতার উৎস । তবে এত সব সত্ত্বেও কিন্তু নিরসন হয় নি ক্লাসিকাল বিশ্বদর্শনের সঙ্গে কোয়ান্টাম জগতের অসামঞ্জস্য ও বিরোধ ।

বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে রয়েছে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ওপর । তবে শুধু পর্যবেক্ষণ বা শুধু পরীক্ষণই কিন্তু বিজ্ঞান নয় । পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকে অর্থবহ করে তোলে তত্ত্ব । পর্যবেক্ষণ আমাদের দেয় বাস্তবতার এক প্রস্থচ্ছেদ, আর তত্ত্ব তার সঙ্গে আর একটি মাত্রা যোগ করে আমাদের দেয় বাস্তবতার এক ছবি যা অতিক্রম করে যায় পর্যবেক্ষণের একমাত্রিক দিগন্তকে । তত্ত্বের স্ফটিকের ভিতর অবয়ব পায় বাস্তবতার ত্রিমাত্রিক রূপ । তবে এখানেই শেষ হয়ে যায় বিজ্ঞানের পথ-পরিক্রমা । স্ফটিকখণ্ডের ভিতর থেকে বাইরে এনে বিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় জীবন-দর্শনের মুক্ত মঞ্চে । আর তখনই তত্ত্ব হয়ে

ওঠে অর্থবহ । বিজ্ঞানীর ইন্দ্রজাল থেকে তার উত্তরণ ঘটে মানুষের উত্তরাধিকারে । তত্ত্বের এই উত্তরণই চেয়েছিলেন আইনস্টাইন ও বোর, আর তাঁর নিজের মত করে সম্ভবত চেয়েছিলেন ফেইনম্যানও । তাই কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের শতবর্ষ পেরিয়ে আজ প্রশ্ন করাই যায় এই অন্তিম চরিতার্থতা লাভের কাছাকাছি কি পৌঁছেছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ? বোর ও হাইজেনবার্গের কোপেনহেগেন ভাষ্য তৈরী হয়েছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বকে এই চরিতার্থতা প্রদানেরই উদ্দেশ্যে । কিন্তু নতুন বিশ্ব-দর্শনের অগ্রদূত হিসেবে তার সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়েছে আজ থেকে বহুদিন আগেই এবং শেষ পর্যন্ত তা পরিণতি পেয়েছে এক বাতিল হওয়া সরকারী সীলমোহরে ।

তাই, উনিশ শ বিশের দশক থেকে চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত যেমন কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সংঘটিত হয়েছিল কোন নতুন বিজ্ঞান-দর্শনের অনুষঙ্গ ছাড়াই, ঠিক তেমনই আশির দশকের পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত দ্বিতীয় কোয়ান্টাম বিপ্লব ঘটে চলেছে ঠিক একই প্রেক্ষাপটে, ক্লাসিকাল বাস্তুবাদী দর্শনের দিগন্ত-অবরোধী পাহাড় ডিঙিয়ে ।

ক্লাসিকাল বিজ্ঞানের তত্ত্ব যদি হয় স্থূলসত্ত্ব জগতের বাস্তবতার নির্যাস তবে প্রশস্ততর প্রেক্ষিতে সেই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব পালন করে এসেছে ক্লাসিকাল বস্তুবাদী দর্শন । তাই এই দর্শন স্বভাবতই ব্যর্থ সূক্ষসত্ত্ব জগতের তত্ত্বকে অর্থবহ করে তোলার কাজে । এ জগতের মননের ঐতিহ্য বহন করে ‘বোঝা’ সম্ভব নয় সে জগৎকে । তাই যখন কোয়ান্টাম পরাবাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে ব্যাকুল বিভ্রান্তিতে মানুষ বলে ওঠে, ‘এ কি করে হতে পারে ? নিশ্চই কোথাও একটা ভুল হচ্ছে’, তখন আজকের দিনের মেধাবী কোয়ান্টাম বিজ্ঞানী ঠিক সেই আগের দিনের মতই আলগা তাচ্ছিল্যে বলেন, বকবক করবেন না, অঙ্ক কষুন । বস্তুত পরীক্ষণ আর গণিত এই দুইয়ের বাইরে আর কিছুর প্রতি আনুগত্য না থাকাটাই আজও কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীর জোরের জায়গা । তবে কি বিদগ্ধ গণিতের বাইরে আর কোন প্রশস্ততর পরিচয় কোন দিনই থাকবে না কোয়ান্টাম তত্ত্বের ?

যেমনটা ঘটেছে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের স্থান-কালের ধারণার বেলায় ? বিজ্ঞান-দর্শন তবে কি চিরতরে সীমিত হয়ে থাকবে স্থূলসত্ত্ব জগতের বাস্তবতার দিগন্তে ?

এ প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বলা খুবই বিপজ্জনক কারণ ইতিহাস কখনো ক্ষমা করে না 'চিরতরে' কথাটিকে । তবে আমাদের মনন প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতার দিকগুলিকে পর্যালোচনা করে মত দিতে হলে যুক্তিবোধ এই নেতিবাচক সিদ্ধান্ত থেকে কিন্তু বড় একটা দূরে যেতে পারবে বলে মনে হয় না । পরিচিত জগতের স্থূলদর্শনে ধরা দেবে না সূক্ষ্মজগৎ । সে জগতের বাস্তবতা এ জগতের নিরিখে হয়ে থাকবে উদ্ভট পরাবাস্তবতা ।

সূত্র :

আন্তর্জালক বা ইন্টারনেটের অকল্পনীয় বিস্তৃতি স্বতন্ত্র সূত্রপঞ্জী ব্যাপারটিকে প্রায় অর্থহীন করে তুলেছে । কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রিটেশান বিষয়ে বহুদিন ধরে বহু ব্যক্তির গবেষণায় সমৃদ্ধ হয়েছে আলোচনার এক বিশাল ভাণ্ডার । আমি এখানে আমার মত করে তারই অল্প এক অংশ তুলে ধরতে চেয়েছি । এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ আন্তর্জালক ভাণ্ডার থেকে দুটি সূত্র উল্লেখ করছি --

(i) Stanford Encylopedia of Philosophy-র অন্তর্গত Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics (এতে বিস্তৃত সূত্রপঞ্জী পাওয়া যাবে) - http://plato.standord.edu / qm-copenhagen

(ii) Wikipedia -এর অন্তর্গত Copenhagen Interpretation; এতেও পাওয়া যাবে একটি উপযোগী তথ্যসূত্র

http://en.wikipedia.org / wiki / Copenhagen_interpretation

কোয়ান্টাম তত্ত্বের গণিত, এর বিবর্তনের নানান ধাপ এবং এর ব্যাখ্যার নানান দিক ধরে লেখা তিনটি বিখ্যাত বই --

(i) J. S. Bell : Speakable and unspeakable in quantum mechanics. Cambridge University Press, Cambridge, 1987.

(ii) Asher Peres : Quantum Theory : Concepts and Methods. Kluwer Academic Publishers, Dodrecht, 1993.

(iii)M. A.Nielseng and I. L. Chuang : Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, cambridge, 2002.

'আলোচনাচক্র', কলকাতা, সংকলন 27, অগাস্ট 2009 সংখ্যায় প্রকাশিত ।